এক : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টি বা সাম্প্রদায়িকতার চরিত্র বা প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও একথা প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে এই বিষয়টি দেশভাগের পেছনে এক অন্যতম অনুঘটকের কাজ করেছিল। এর প্রকৃতিকে বোঝার জন্য একটু পেছনে ফিরে তাকানো প্রয়োজন। যে ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে ভারত-ভাগের পর থেকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামে অভিহিত করা হতো তার সেই সময়কার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশেষতঃ সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে-পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিতে সবক্ষেত্রেই হিন্দুরা সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকেও সর্বৈব ভাবে তাদের অবস্থান ছিল উচ্চে। শিক্ষার অগ্রগতির কারণে তাঁরা সমাজে বিশেষ সমাদর পেতেন। অর্থনৈতিক বলের ক্ষেত্রেও তাঁদের সামাজিক প্রাধান্য ছিল। গ্রামের দিকে হিন্দু জমিদারদের দ্বারা মুসলমান গরীব চাষীকে শোষণ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তৎকালীন সময়ের জনসমষ্টির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রোমন্থন, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রভৃতি থেকে স্পষ্ট উঠে আসে একাধারে এক নিরবচ্ছিন্ন ও নিশ্চিত জীবনযাত্রা ও অন্যদিকে এক ভিন্ন ধরনের সামাজিক 'শক্তি ভারসাম্যের' (power relationship) দিকটির কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হল—ঐতিহ্যগতভাবে এই সামাজিক বিন্যাস কেমন মজ্জাগত হয়ে গেছিল গ্রাম বাংলায়। বস্তুতপক্ষে তা এক নির্দিষ্ট সংস্কৃতির জন্ম দিতে পেরেছিল বলা যায়। কারণ এর মধ্যে যেমন এক 'উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত', 'জমিদার-কৃষক', 'গিন্নীমা বা কর্তামা-চাষাপত্নী' সম্পর্কের দিক ছিল : ঠিক তেমনই ছিল এক মানবিক মেলবন্ধন-এক নির্ভরশীলতার বিশ্বাসের সম্পর্ক।[২] 'রাজনীতি' নামক একটি শব্দ যাকে পরবর্তীকালে অনেকটা নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়। শুরু হয় এক ভয়ঙ্কর জনসংখ্যাগত বিপ্লব : যে ঘটনায় শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবাংলায় নয় সমগ্র পৃথিবী এর সাক্ষী হয়ে আছে। ডমিনিক লেপিয়ার ও ল্যারি কলিন্সও এই একই কারণে— '...the greatest human migration in history' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩]

অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস তাঁর বইতে 'সাম্প্রদায়িকতা' শব্দটিকেই খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে 'communal riot' বা 'communcal violence' এর ধারণাটি মূলত 'community' বা 'সম্প্রদায়' শব্দটি থেকে এসেছে।[৪] বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এই 'সম্প্রদায়গত চেতনা' এখানে উঠে এসেছিল ব্রিটিশ শাসনের সৌজন্যে। তারপর এর সযত্ন লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তৎকালীন তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা কর্মীরা। বাংলাদেশ জাতীয় মহাফেজখানা থেকে পাওয়া পুলিশ রিপোর্ট ও হোম-পলিটিকাল বিভাগের কাগজপত্র ঘাঁটলে এই তথ্য পরিষ্কার উঠে আসে যে, ১৯৩০-এর দশক থেকেই এক ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় পাবনা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায়। যদিও এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের চরিত্র ছিল ভিন্ন, অধিকাংশ সময়েই এটি এক স্থানীয় বা গ্রামীণ প্রকৃতি ছিল। কিন্তু তা

সত্ত্বেও দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরার দিকে সাধারণ মানুষের অভিপ্রয়ানের সূচনা হয় কিন্তু ওই সময়েই।[৫]

দেশভাগকে কেন্দ্র করে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি সংগঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ১৯৪৬ সালের 'The Great Calcutta Killing'। এটি বোধহয় কলকাতার প্রথম সুসংগঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল—যা পুরোপুরি রাজনৈতিক কার্যাবলির প্রসূত ছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাত থেকে একচ্ছত্র রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য ও বিশেষত ভারতীয় মুসলিমদের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করার জন্য ১৬ আগস্টকে 'Direct Action Day' হিসেবে নির্ধারণ করে, মহম্মদ আলী জিন্নাহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে—'What we have done today (the day when the League Council passed the Direct Action resolution) is the most heroic act in our history. Never have we...none anything except...by constitutionalism. But now...we bid godbye to Constitutional methods.'[৬] এই ১৬ আগস্ট কলকাতায় নিয়ে এসেছিল এক বিভীষিকা। মানিকতলা, রাজাবাজার, ট্যাংরা, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর, পার্ক-সার্কাস, মৌলালী, শোভাবাজার ইত্যাদি প্রতিটি জায়গায় দাঙ্গার প্রকারভেদ ছিল। কিন্তু নৃশংসতা ও নির্মমতার নিরিখে একটি পূর্ববর্তী সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ছাপিয়ে গেছিল। যদিও ১৭ই আগস্টই প্রচারিত হয় শান্তিরক্ষার জন্য সব দলের নেতাদের আবেদন :—

"ভাইসব,

ভাই-ভাইয়ের মধ্যে এই যুদ্ধ অবিলম্বে থামাইবার জন্য আমরা আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। আসুন এই কাহিনী আমরা ভুলিয়া যাই। কে দোষী আর কে নির্দোষ সেই তর্ক করিতে থাকিলে আরো জীবন ও ধন সম্পত্তি নষ্ট হইবে। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে এখানেই তাহার শেষ হউক। এই মারামারি এখন যেমন করিয়াই হউক বন্ধ করিতেই হইবে।

প্রত্যেক ভাইকে আমাদের অনুরোধ, আপনারা আমাদের পরামর্শ শুনুন। ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে। লাঠি বা অস্ত্র লইয়া চলাফেরা করিলে জীবন বিপন্ন বা গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা।

আপনারা যে যাঁহার মহল্লায় থাকুন, অপরের মহল্লায় বা পাড়ায় অনধিকার প্রবেশ করিবেন না। সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া মহল্লা শান্তিরক্ষা বাহিনী গঠন করুন এবং সম্মিলিত ভাবে শান্তি রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করুন।

নিবেদক—স্বাক্ষর

শরৎচন্দ্র বসু	এইচ এম সোহরাবর্দ্দী
খাজা নাজিমুদ্দীন	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
দেবীপ্রসাদ খৈতান	কিরণ শঙ্কর রায়
ভূপেশ গুপ্ত	মোহম্মদ আকরম খাঁ
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার	মোহর সিং গিয়ানী
পাঁচুগোপাল ভাদুরী	সামসুদ্দীন আহমেদ
আবুল হাশিমক্ষ	ভবানী সেন
খাজা নুরুদ্দীন	হামিদুল হক চৌধুরী

(কলিকাতা ১৭ই আগস্ট, ১৯৪৬)"[৭]

কিন্তু এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের কাউন্সিলের অধিবেশনে যেভাবে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয় যে— "The Muslim Nation to resort to Direct Action to achieve Pakistan and the consequent fixing of August 16th as 'Direct Action Day'"।[৮] এই ঘোষণার থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল স্পষ্ট। তার ওপর ইন্ধন যোগায় আর একটি ঘোষণা। সেদিন কলকাতার রাস্তায় প্রথম আগ্নেয়াস্ত্র সহ রাজনৈতিক মিছিলে অংশগ্রহণকারী ৩০,০০০ জনতা (মতান্তরে ১,০০,০০০) মনুমেন্টের তলায় মুসলিম লিগের ডাক সভায় জড়ো হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সোহরাবর্দী তাঁর উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণে বলেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে 'restrained' রাখার কথা। যার ফলে সেদিনকার সভার মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ভাষণে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলমান সাধারণ মানুষ সভার শেষে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও হিন্দুদের প্রতি আক্রমণ, বিশেষত দোকান লুঠ করতে বিশেষভাবে প্ররোচিত হয়।[৯] অধিকাংশ তথ্যসূত্রও এই ঘটনাকেও সমর্থন করে যে সন্ধ্যেবেলা দাঙ্গার ব্যাপকতা ও বীভৎসতা বৃদ্ধি পেলে সোহরাবর্দী স্বয়ং অন্যান্য মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলরুমে উপস্থিত থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। এই দাঙ্গার পেছনে এছাড়া গুজবের ভূমিকাও ছিল অনেকটাই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে সত্যের পাশাপাশি অনেক মিথ্যে খবর ছাপানো হতে থাকে, পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন—'আজ হরতাল' 'Direct Action Day'। ক্রমাগত গুজব রটছে চারদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। ফাঁড়ির ওদিকে নাকি গোল বেধেছে। মসজিদের সামনে ভিড় দেখে এলাম। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে 'defence party' গড়ছে। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে ছোঁয়াচ লেগে নার্ভাস হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর ফাঁড়ির দিকে আগুন লেগেছে মনে হল।' কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলার সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'দাঙ্গার সময় বুঝেছিলুম রিলিজিয়ান (ধর্ম) কি বস্তু।' 'তখন ছিল একটাই লজিক : যত মুসলমান এ পাড়ায় মরবে ততই ততই ও পাড়ায় হিন্দুরা বাঁচবে। ১৬ই আগস্ট মুসলমানরা লুটপাট শুরু করে আর হিন্দুরা শুরু করে খুন। ১৭ই থেকে শুরু হয় আম-কোতল।' ১৮ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতা'-র সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয়।[১০] ১৬ই থেকে ১৮ই আগস্ট-এই তিনদিন কলকাতা ছিল একদল রক্তলোভী উন্মাদের দখলে। গোটা শহরটাকে দেখাচ্ছিল নিস্তব্ধ শবের মতো।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু মহাসভা বা বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দায়িত্বও কম ছিল না। মুসলিম লিগ বারবার অভিযোগ জানিয়েছিল যে, কংগ্রেসের উপর বাংলায় হিন্দু মহাসভার প্রভাব ও কতৃত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি হিন্দু পত্রিকাগুলি প্রথম থেকেই মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছিল। দৈনিক আজাদ পত্রিকাও এই সময় লিখেছিল যে বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা

মুসলিম লিগ দাঙ্গাবাজদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে ওঠেন। বেশ কিছু কংগ্রেস সম্পত্তি লুঠ করা হয়। কংগ্রেস নেতা ডঃ বি. সি. রায়-এর বাড়িতে আগুন দেওয়া হয় এবং বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসও আক্রমণ করা হয়। ১৮ই আগস্ট তারিখে কলকাতার অবস্থার বিশেষ উন্নতি তো হয়ই নি, বরং অবনতি দেখা যায়। সেনাবাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে না পড়তে পারার দরুণ সেদিন থেকে শুরু হয় হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণের পালা, যার নেতৃত্ব দেয় কলকাতার সর্বত্র ছড়ানো হিন্দু কালোয়াররা। তাদের নৃশংসতা আগের দুদিনের মুসলমানদের হিংস্রতার তুলনায় কোনো অংশে কম ছিল না। মাড়োয়ারী, ওড়িয়া, বিহারী লোকেরা যারা পেশাগত কারণে কলকাতায় বসবাস করত, তারাও ধর্মের কারণে আক্রান্ত হয়। যেমন, খিদিরপুরের মেটিয়াব্রুজের লিচুবাগান অঞ্চলে কলকাতা ডকে কর্মরত একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় প্রায় তিনশত উড়িষ্যাবাসী শ্রমিক বাস করত। দাঙ্গার সময় মাত্র ১৫ মিনিটে তাদের প্রত্যেককে কচুকাটা করা হয়।[১১] এছাড়া এই প্রথম দাঙ্গায় ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার ব্যবহার শুরু হয় কলকাতা থেকেই। অবশ্য এ সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঘটনা যে ঘটেনি তা নয়। বহু সাধারণ লোক মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছেন শোভাবাজার অঞ্চল থেকে প্রায় ১৫০ জন বিপন্ন মুসলমানকে হিন্দুরা উদ্ধার করে। রাজাবাজারে দেখা যায় প্রায় ৬৫ জন মুসলিম শ্রমিক ১৮ই আগস্ট ভাত খাচ্ছেন আর হিন্দু প্রতিবেশীরা তাদের পাহারা দিচ্ছেন। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হ্যারিসন রোডে জংশন এলাকায় পাঞ্জাবী মুসলমানদের সহায়তায় বহু হিন্দু ধনী পরিবার রক্ষা পান। এছাড়া গুণ্ডাদের টাকা দিয়েও বাঁচেন অনেকে। দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দৃষ্টান্ত হিসাবে টাওয়ার লজ এর ঘটনা উল্লেখযোগ্য। রণেন সেন তাই পরে বলেছেন—'আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলুম কিন্তু তার গভীরতা অনুধাবন করতে পারিনি।'[১২]

২০ আগস্ট থেকে কলকাতা শহরের অবস্থা ক্রমশঃ স্বাভাবিক হতে থাকে। মৃতের সংখ্যা কতয় দাঁড়িয়েছিল তা বলা মুশকিল। সরকারী সূত্র থেকে জানা যায় শুধু কলকাতায় নিহতদের সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০ এবং আহত হয়েছিল প্রায় ৪,৫০০ লোক। এর মধ্যে শুরু হয়েছিল বিশেষ করে মুসলিম জনতার শহর ছাড়ার হিড়িক। ইতিমধ্যে প্রায় ১,৫০,০০০ লোক শহর ত্যাগ করেছিল এবং ৯০,০০০ মানুষ দুঃস্থাবাসে ছিল। কিন্তু বেসরকারী সূত্র থেকে জানা যায়-চার দিনের এই নরমেধ যজ্ঞে কমপক্ষে ৫,০০০ (মতান্তরে ১০,০০০) নরনারী, বৃদ্ধ-শিশু নিষ্ঠুরভাবে নিহত, ১৫,০০০ মতো আহত, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিরাপত্তার জন্য হিন্দুদের স্বধর্মীয়দের এবং মুসলমানদের মুসলিম অধ্যুষিত পাড়ায় বিপুল সংখ্যক স্থানান্তর, যা দেশ বিভাগের ভিত্তি রচনা করে।[১৩] আবুল হাশিম এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে সোহরাবর্দ্দী ১৬ই আগস্টকে সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও মুসলমানরা এ দাঙ্গায় কোনভাবে জড়িত ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালবাহিনীর দ্বারা যে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছিল, সেটা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবসের পর ভয়াবহ যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়।[১৪]

কলকাতা দাঙ্গার ঠিক সাত সপ্তাহ পরে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় এই একই রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মূলতঃ কলকাতায় দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বড়িশায়, পাবনা প্রমুখ জেলায় ছোট বড় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লেও ওই একই বছরের ১০ই অক্টোবর ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব কোণে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও সন্দীপ এলাকায় যে একতরফা হিন্দু নিধন ও উৎপীড়ন পর্বের সূত্রপাত হয়, তা এর মধ্যে ভীষণতম। নোয়াখালি অঞ্চলে হিন্দুবিরোধী মানসিকতায় ব্যাপক প্রচারের পেছনে একটি স্থানীয় রাজনৈতিক কারণও ছিল। তা হল একশ্রেণির মুসলমান দ্বারা পীর রূপে পূজিত লিগের স্থানীয় নেতা মিঞা গোলাম সারওয়ারের নব দীক্ষিতের উৎসাহের সাম্প্রদায়িকতার প্রচার ও সংগঠন।[১৫] এছাড়া কলকাতার দাঙ্গার দ্বিতীয় দিন থেকে মার খাওয়া মুসলমানদের কাহিনীও ইতিমধ্যে ওই এলাকায় পল্লবিত হয়ে প্রচারিত হয়। কলকাতার দাঙ্গায় উৎপীড়িত মুসলমানদের মধ্যে অনেক নোয়াখালিবাসীও ছিলেন।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় সংগঠিত এই আন্দোলনের মূল কারণ ছিল-অর্থবান হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের আক্রোশ। ১০ই অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে প্রায় ১৫ দিন একটানা ও তারপরেও অবাধে হিন্দু উৎপীড়ন চলতে থাকে। লিগ সরকার প্রায় এক সপ্তাহ এ খবর প্রকাশ করতে দেন নি। ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাবলীতে প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে একটি হিসেবে জানা যায়। ব্যাপক বাস্তুত্যাগের ঘটনাও ঘটে ওই একতরফা আক্রমণের ফলে। দুটি জেলাকে মিলিয়ে প্রায় ৩৫০টি গ্রাম আক্রান্ত হয় এবং ১৫ই নভেম্বর অবধি ১১২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করার জন্য। এই দাঙ্গার মূল উদ্দেশ্য ছিল বহু মন্দির ধ্বংস বা অপবিত্র করা, হিন্দু ব্যক্তিদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, এবং সর্বোপরি নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা বা কোন কোন ক্ষেত্রে জোর করে মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া।[১৬]

এই সময় উপদ্রুত অঞ্চল থেকে প্রায় ৭৫ হাজার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ-শিশুসহ কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ইত্যাদি স্থানের ত্রাণ কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই দাঙ্গা মোটেই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ছিল চূড়ান্তভাবে পরিকল্পিত। এর নির্দিষ্ট শ্রেণীচরিত্রও ছিল এবং সরাসরি এটি প্রভাবিত হয়েছিল সমসাময়িক রাজনীতির দ্বারা। তাই এই সময় সাম্প্রদায়িকতা একটি নির্দিষ্ট 'ideology' তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিল বলা যায়। শুধু তাই নয় এর একটি প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠা হয় সমাজে।[১৭] আবুল মনসুর আহমেদ লিখেছেন যে "অনেক অতি-সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজও সগর্বে বলিয়া থাকে কলিকাতা দাঙ্গাই পাকিস্তান আনিয়াছিল। একথা নিতান্ত মিথ্যা নয়। এই দাঙ্গার পরে ইংরাজ-হিন্দু-মুসলিম তিনপক্ষই বুঝিতে পারে, দেশ বিভাগ ছাড়া উপায়ান্তর নাই।"[১৮] শেষ পর্যন্ত মহাত্মাগান্ধীর নোয়াখালির আগমন ও গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন হয়তো হিন্দুদের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে কিছুটা সহায়তা করেছিল। গান্ধী একদল সহকর্মীকে নিয়ে ওই বয়সে নোয়াখালী ও তৎসংলগ্ন পীড়িত অঞ্চলে শান্তি মিশনের সূচনা করেন, যা ওই ভয়াবহ ক্ষতের উপর কিছুটা প্রলেপ দিয়েছিল।[১৯]

সেই ছিল শুরু। ক্রমশঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পূর্ববাংলার সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংখ্যালঘুশ্রেণী এই সন্ত্রাসের দ্বারা তাড়িত হয়ে দেশত্যাগ করতে শুরু করে। সাম্প্রদায়িকতার বাস্তবভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা-পূর্ব যুগের থেকে এবং দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের যখন আবির্ভাব বা জন্ম হয় তখন তা সাম্প্রদায়িকতার দর্শন থেকে মুক্ত ছিল না : পরবর্তীতেও কখনো মুক্ত হতে পারেনি।[২০] সংখ্যালঘুদের আইনি শাসনের উপর অধিকারও পূর্ব-পাকিস্তানে আর কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দুই : উদ্বাস্তু স্রোত

মোটামুটি অর্ধশতকের নিস্তব্ধতার পর ১৯৪৭ সালের 'দেশভাগ'-এর প্রাসঙ্গিকতা বা সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে গবেষক মহলে যে তথ্যের, তত্ত্বের বা বিশ্লেষণের ঝড় উঠেছে তাতে একটা বার্তা স্পষ্ট উঠে আসে যে তৎকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'দেশভাগ' অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। ঘটনা প্রবাহে এই অমোঘ পরিণতি প্রসঙ্গে নেহেরুও স্বীকার করেছিলেন যে-'সত্যি কথা এই যে, আমরা ছিলাম ক্লান্ত মানুষ, বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল। আবার জেলে যাওয়ার ভবিষ্যত আমাদের অল্প লোকই সহ্য করতে পারত...ভারত ভাগের পরিকল্পনা এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ হাজির করেছিল, আমরা সেটাই গ্রহণ করলাম। আমরা আশা করেছিলাম, এই বিভাগ হবে সাময়িক, পাকিস্তান আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য।"[২১] কিন্তু এই দেশভাগ বাংলার মানুষের মধ্যে অদ্ভুত এক ভীতি ও স্ব স্ব রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার অনুভূতি সৃষ্টি করে, যে চেতনার দ্বারা তাড়িত হয়ে শুরু হয় ব্যাপক বাস্তুত্যাগ ও সুরক্ষার খোঁজে অন্য রাষ্ট্রে অভিপ্রয়ান। সে সময়ে মৃদুলা সারাভাই ও লীলা রায়ের মতো ব্যক্তিত্বদের কর্মকাণ্ডের কথা জানা যায়; যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করেছিলেন। শ্রীমতি লীলা রায় যেমন লিখেছেন যে, ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে এক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব দেওয়া হয় "সেই অবধি আমি (লীলা রায়) গত ১৮ মাস যাবৎ প্রধান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করি...বহুস্থানে বাড়ি দখল ও চাকুরীদান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সংখ্যালঘুদের ওপর যে অত্যাচার চলতে দেখি, পূর্ববঙ্গ সরকারের নিকট সে সম্পর্কে অভিযোগ করলে কোন ফল পাই না।"[২২] পূর্ববঙ্গ সরকার কিন্তু সরকারীভাবে বিবৃতি দেয় যে "হিন্দুদের ব্যক্তিগত কারণে স্থানান্তরগমণ" ঘটেছিল ...অভিপ্রয়াণের সংখ্যাতত্ত্বও "নিছক কাল্পনিক"। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ থেকে 'ডন' ও 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় 'হিন্দু-মুসলমান শান্তি ও সম্প্রীতির" কামনা করা হয় বার বার। কিন্তু 'Morning News' পত্রিকায় দেখা যায় ১৯৪৮ সালে দক্ষিণারঞ্জন বসুর লেখা 'ছেড়ে আসা গ্রাম', অবিনাশ চন্দ্র সাহার লিখিত 'জয়া' উপন্যাস, যাযাবরের লেখা 'ঝিলাম নদীর তীরে' ইত্যাদি বইগুলি ক্রমাগত বাজেয়াপ্ত করে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার। এর পেছনে তাঁরা যুক্তি দিয়েছিলেন— 'It contains matters calculated to promote feelings of enmity or hatred

between different classes of people of Pakistan'।[২৩] এই বক্তব্যের তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়। ১৯৪৮ সাল থেকেই শুরু হয় পাকিস্তান পুলিশ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের পশ্চিমবঙ্গে আগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের উপর নিগ্রহ, অত্যাচার ও লুটপাট। নীচের একটি সারণীর মাধ্যমে তাদের পাশবিক অত্যাচার বা লাঞ্ছনার চিত্র উপস্থিত করা হল—

ব্যক্তির নাম	স্থান	দেশ	তারিখ
কানু মহম্মদ চৌধুরী	জাগীর পাড়া (দিনাজপুর)	পাকিস্তান	১৯৪৮ ২৪ শে মার্চ
জিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	দিনাজপুর	পাকিস্তান	১৯৪৮ ২৫ শে মার্চ
রাজেন্দ্রনাথ সরকার	গোয়ালদি (মালদা)	ভারত	১৯৪৮ ২৫ শে মার্চ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	তপন (পঃ দিনাজপুর)	ভারত	১৯৪৮ ২৫ শে মার্চ
বসন্তকুমার কর্মকার	ধানখোলা (কুষ্টিয়া)	পাকিস্তান	১৯৪৮ ২৫ শে মার্চ
সুদীপচন্দ্র মুখার্জী	পাটগ্রাম	পাকিস্তান	১৯৪৮ ২৬ শে মার্চ
ক্ষিতিশচন্দ্র রায়	তুষভাণ্ডার (রংপুর)	পাকিস্তান	১৯৪৮ ১লা এপ্রিল
কিছু মুচি সম্প্রদায়	নদীয়া	ভারত	১৯৪৮ ৪ঠা এপ্রিল
জনৈক আধিকারীক	মুর্শিদাবাদ	ভারত	১৯৪৮ ৪ঠা এপ্রিল
মহঃ গোলাম হোসেন	কালীগঞ্জ ঘাট	পাকিস্তান	১৯৪৮ ৫ই এপ্রিল

পূর্ব পাকিস্তানে এই একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল ব্যাপকহারে হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া। ১৯৪৯ সালে ৩রা ডিসেম্বর 'The Nation' পত্রিকায় লেখা হয়—পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সাধারণ সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর তো বটেই, বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু কর্মচারীদের ওপরে যে হারে অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি করেছে। 'The Nation' পত্রিকায় এর সমাধান সূত্র হিসেবে বলা হয় যে, 'The Indian Government is the only repository of power that can compel Pakistan to play a fair game with the minority in their charge'। তাজউদ্দীন আহমেদ কিন্তু এই একই সময় মন্তব্য করেছেন—'ভারতের ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িক মহলের কাছ থেকে সে দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ অস্তিত্বহীনতার হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সংখ্যালঘুদের বিতাড়ন করা। কিন্তু পাকিস্তানের জনগণ চায় সংখ্যালঘুরা এখানে বসবাস করুক। একটাই সমস্যা, কিভাবে তাদের এখানে রাখা যাবে।'[২৫] ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময় পূর্ববাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমন রূপ ধারণ করেছিল যে প্রতিবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর নমঃশূদ্ররাও দেশত্যাগে

বাধ্য হয়। নমঃশূদ্রদের অনেককে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হলেও তাদের সামাজিক অবস্থান কিন্তু পরিবর্তিত হয়নি। এই পারস্পরিক অবিশ্বাসের বিষয়টি অনুধাবন করে নমঃশূদ্রদের নেতা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোগেন মণ্ডলও পরে মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দেন।[২৬]

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য লোকসভা ও আইন সভা বিতর্ক, Indian Statistical Institute-এর সার্ভে রিপোর্ট, বিশেষতঃ ১৯৫০-৭১ সাল অবধি Assembly proceedings-গুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রায় ৬০ লক্ষ লোক এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়[২৭]-এর লেখনী থেকেও এই তথ্যের সমর্থন মেলে। তিনি তাঁর 'উদ্বাস্তু' নামক বইতে উল্লেখ করেছেন ১৯৫০ সালের প্রথমে ব্যাপক দাঙ্গার ফলে যদিও হিন্দুরা বিপুল সংখ্যায় বাস্তুত্যাগ করতে শুরু করে কিন্তু ১৯৫১-র পরবর্তীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন, ধর্ষণ বৃদ্ধি পেলে হিন্দুরা পুরোপুরি দেশত্যাগে বাধ্য হয়। অভিজিৎ দাশগুপ্তর মতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অভিপ্রয়াণ হয়েছিল ১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে। প্রণতি চৌধুরী[২৮] মন্তব্য করেছেন যে দেশভাগের সময় থেকে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত প্রায় ৩৫ লক্ষ হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসেন। ১৯৫০ সালে 'Delhi Pact' এর সময় যদিও তথ্য অনুসারে প্রায় ১২ লাখ হিন্দু দু-দেশের সরকার থেকে নিশ্চয়তা পেয়ে আবার পূর্ব-পাকিস্তানে ফিরে যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তথ্য এটিও যে এই একই সময়ে প্রায় ১১ লাখ মুসলিম পশ্চিমবাংলা থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে চলে যায়, আবার যার মধ্যে ৭.৫ লাখ মানুষ পুনরায় পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসে।[২৯]

১৯৫০ সালে নেহেরু লিয়াকত চুক্তি থেকেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিকে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এমনকি এই চুক্তিতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জনসাধারণকে সুরক্ষা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে। এই চুক্তির মাধ্যমে মোটামুটি এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল যে পশ্চিম পাঞ্জাব সম্বন্ধে দেড় বছর আগে যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল (দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ ও সম্পত্তির বিনিময়) এখানে তার ঠিক বিপরীত নীতি প্রয়োগ করা হবে। সেই সময়ের পুনর্বাসন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন-এর বক্তব্য থেকেও এই বিষয়ে সমর্থন মেলে। কারণ তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন যে রাষ্ট্র সেই সময়ে ভেবেছিল, উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের সৃষ্টি হবে, তাকে সামাল দেওয়ার চেয়ে, সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাসকে তৈরি করা সহজ যে তারা স্ব স্ব দেশে নিরাপত্তা পাবে। একথা মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে প্রথমদিকে নেহেরু তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ভেবেছিল, এই সংকট সাময়িক এবং যে প্রচুর পরিমাণ উদ্বাস্তুর ঢল নেমেছে, তা কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় স্বদেশে ফিরে যাবে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী জোরালো দাবী জানিয়েছিলেন মানুষ ও সম্পত্তি বিনিময় নীতি বাংলার ক্ষেত্রেও গ্রহণের পক্ষে। ১৯৫০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কিত বিতর্কে দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরু এর বিরোধিতা করেছেন। প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তীও

উল্লেখ করেছেন যে আন্তঃডোমিনিয়ন সম্মেলনের ব্যর্থতার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় এর চিঠির উত্তরে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে পূর্ববর্তী সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। তাই বাংলার উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। ১৯৪৯ সালের ১লা ডিসেম্বরে ড. বিধানচন্দ্র রায় নেহেরুকে স্পষ্ট লিখেছিলেন—কেন্দ্রীয় সরকার ২৬ লক্ষ উদ্বাস্তুকে মাথাপিছু মাত্র ২০ টাকা প্রদান করেছে, আর্থিক অনুদান হিসেবে।[৩০]

পাঞ্জাবের দিকে আগত পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে সঠিকভাবে পুনর্বাসন প্রদান করা হয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে একই নীতি গ্রহণ করা হয়নি। তবে এর সঙ্গে একথাও সত্য যে পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা যেমন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই দেখা গিয়েছিল বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, বিশেষ করে "বাঙালিত্ব" রাখার জন্য তারা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়োজোর ত্রিপুরা—আসাম, বিহার, উড়িষ্যায় জড়ো হয়। মার্কাস ফ্রাণ্ডাও লক্ষ্য করেছেন যে "The West Bengal intelligentsia shied away from any description of communal violence and uprooting of Hindus in East Bengal"[৩১]

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকেও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ লোকেরা পশ্চিমবঙ্গে এসে সবচেয়ে বেশি স্বস্তিবোধ করত। যে কারণে প্রায় ৭৩ শতাংশ বেশি উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে ওঠে, যা ছিল মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের ১ ভাগ। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে-উদ্বাস্তু সমস্যা যেখানে ছিল একটা 'জাতীয় সংকট', পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেই এটি মূলতঃ রাজ্য সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের Assembly Proceedings লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৫০-৭১ সালের মধ্যে এই রাজ্যে যে বিভিন্ন ধরনের উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠেছিল তা অধিকাংশই সরকারী আনুকূল্যে টিকে ছিল। এখানে বিভিন্ন জেলাগুলির অবস্থান থেকে দেখা যায় যে—সবচেয়ে বেশি পরিমাণে উদ্বাস্তু জড়ো হয়েছিল ২৪ পরগণা, নদীয়া ও কলকাতাতে। ২৪ পরগণায় ২৭.৫ শতাংশ, নদীয়ায় ২৫.১ শতাংশ, কলকাতায় ১৫ শতাংশ, কোচবিহার ৭.৩ শতাংশ, পশ্চিম দিনাজপুর ৪.৮ শতাংশ, জলপাইগুড়ি ৪.১ শতাংশ, বর্ধমান ১ শতাংশ, হুগলি ২.৬ শতাংশ, হাওড়া ২.৪ শতাংশ, মুর্শিদাবাদ ২.৩ শতাংশ, মালদা ২.২ শতাংশ, তাই দেখা যায় যে, প্রায় ৬৮ শতাংশ উদ্বাস্তু মূলতঃ তিনটি জেলায় ভিড় করেছিল ১৯৪৯-৫০ সাল নাগাদ। এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের রাজ্য সরকারের প্রদত্ত ঋণের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলায় বসতি স্থাপনে সহায়তা করা হয়েছিল।[৩২] পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন জেলায় শুধুমাত্র ১৯৫৩ সাল অবধি বসতি স্থাপন করেছিল ৪৮ হাজার ৮৬৪টি পরিবার।[৩৩] ১৯৭৩ সাল অব্দি তথ্য অনুসারে প্রায় ৯ লাখ উদ্বাস্তু কলকাতা জেলায় বসতি স্থাপন করেন। স্বভাবতই এই জেলাগুলিতে এবং বিশেষতঃ এর আর্থ-সামাজিক জীবনে এক প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যেহেতু পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের এক অংশ ছিলেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত শহুরে, তাই তারা চাকরীর সন্ধানে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে থাকতে

আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ের মুখ্যমন্ত্রীও মন্তব্য করেছিলেন যে— "The refugees do not want to go to the districts of Bankurad, Birbhum, Midnapore, but they want to go to Nadia district, where more than 9 lacs refugees are living."[৩৪]

১৯৬০-এর দশকে উদ্বাস্তুরা মূলতঃ রাণাঘাট ও চাকদায় থাকতে শুরু করেছিল। রাণাঘাটেই প্রায় ৩ লাখ উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করেছিল এবং সেখানে ১৯টি সরকারী কলোনী গড়ে ওঠে, যাতে প্রায় ৫৩ হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় পেয়েছিল। এই সময়ে কুচবিহার, মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলাতে অনেকগুলো ব্যক্তিগত কলোনী গড়ে ওঠে। সি. এম. ডি. এ-এর একটি রিপোর্টেও দেখা যায় যে, এই সময়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গে ১১০৪টি কলোনী গড়ে ওঠে, যার মধ্যে ৪৬.১৯ শতাংশ (৫১০টি কলোনী) কলকাতা শহরের মধ্যে এবং ৩৩.৮১ শতাংশ (৫৯৪টি কলোনী) পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলাগুলিতে তৈরি হয়েছিল।[৫৩]

সরকার যখন অনুভব করে যে, বেশ কিছু উদ্বাস্তু আর ফিরে যাবে না, তখন ভারত সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য চিরস্থায়ী ভাবে কিছু বন্দোবস্তের কথা ভাবতে শুরু করে ১৯৫০-এর দশকে যেমন ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন টাউনশিপ গড়ে তোলার পরিকল্পনা তুলে ধরে, যার মধ্যে নদীয়া জেলার ফুলিয়া নামক অঞ্চল ছিল অন্যতম। কাঁচড়াপাড়ায়ও ১২ হাজার একর জমি নিয়ে এই ধরণের একটি টাউনশিপ গড়ে তোলা হয়।[৩৬] ১৯৪৮-৫৮ সালের মধ্যে প্রায় ৩৮৯টি সরকারী আনুকূল্যে রিফিউজি কলোনী দেখা যায়, যার মধ্যে ৫৪ শতাংশ কলোনী ছিল ২৪ পরগণা জেলায়। ১৯৫২ সালের পর থেকে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করে, চেষ্টা করা হয়েছিল উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশকে অপেক্ষাকৃত কম করা। কিন্তু ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পুনর্বাসন মন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে এই সময়ের মধ্যেই ২৫ হাজার লোক পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবাংলায় চলে আসে। কোনো পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই। দেশভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য কিন্তু জনসংখ্যার হিসাবে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পঞ্চম।

অমলেন্দু দে উল্লেখ করেছেন যে, উদ্বাস্তুদের ভিড় খণ্ডিত বাংলার নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল; তবু এটি ছিল এক ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিহাস।[৩৭] মূলতঃ এই সময়েই অন্ধকার থেকে নতুন আলোর দিকে এক অভিযান শুরু হয়েছিল। বাঙালির ইতিহাসে এটি এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ছিল সর্বার্থেই খুব সঙ্কটময়।

স্যার যদুনাথ সরকারও উল্লেখ করেছেন—১৯৫১-৫২ সালে শিক্ষার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক জনসংখ্যা তুলনায় ক্রমশঃ কমে গিয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'কলকাতার কড়চা'-য় ১৯৬৬ সালেও এই একই ধরণের সঙ্কটের তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং মধ্যবর্তী কয়েক বছরেও যে উদ্বাস্তুদের অবস্থা ও অবস্থান খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি—তা বলাই বাহুল্য। সমকালীন আরো দুটি আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে এই তথ্যের সমর্থন মেলে। শৈবালকুমার গুপ্তর 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যা দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালী উদ্বাস্তুর আর্থিক দুরবস্থা ও তজ্জনিত

অবক্ষয়ের কথা বলে। তিনি দণ্ডকারণ্যে কর্মসূত্রে উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সরাসরি মেলামেশার সুযোগ পেয়ে অনুভব করেছিলেন যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা কতটা মানুষের নৈতিক ও আত্মিক অবনতির কারণ হয়ে উঠতে পারে।[৩৮] এই সময়ে উদ্বাস্তুদের মূল সমস্যা ছিল অভাব তথা দারিদ্র, যা বিভিন্ন অসামাজিক কাজ করতে তাদের বাধ্য করেছিল। দেশভাগ পরবর্তী কলকাতা শহরাঞ্চল ও এই একই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। বহুলোক শুধু অভাবের কারণেই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অশোক মিত্র তাঁর লেখা 'তিন-কুড়ি-দশ' নামক বইতে স্পষ্ট উল্লেখ করেন, দেশভাগ কিন্তু পূর্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয় (তথাকথিত ঘটি ও বাঙাল) প্রত্যেকের ধারণাকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্পর্শ করেছিল। এমনকি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ বদলের এক নতুন মনোভাব তৈরি হয়।[৩৯] কিন্তু 'আপিলা-চাপিলা'-র লেখক অশোক মিত্র তাঁর আত্মজীবনী মূলক রচনায় কিন্তু অন্য ধরণের এক ছবি তুলে ধরেছেন। তাঁর বইতে বরং দেখা যায়—এই সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষতঃ পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসা জনস্রোত তার সাংস্কৃতিক জীবনকে কতটা সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল।[৪০] জয়া চ্যাটার্জীর লেখনী থেকেও স্পষ্ট অনুধাবন করা যায় সরকারের উদ্বাস্তুদের নিয়ে বিরক্তির বিষয়টি। সরকার কখনোই ভাবেনি যে পুনর্বাসন পাওয়াটা এই উদ্বাস্তুদের 'right' সরকার এক্ষেত্রে 'charity' করছে না।[৪১]

'দেশভাগ'-এর প্রভাব মেয়েদের জীবনে এসেছিল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। সমসাময়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যথা—নেহেরু, জিন্না, ফজলুল হক, সুরাবর্দী, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখরা প্রত্যেকেই জাতি বা সম্প্রদায়কে বেশি গুরুত্ব প্রদান করার ফলে, তৃণমূল স্তরের মানুষদের কাছে এই আনন্দের স্বাধীনতা যে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িকতা, হত্যা, তিক্ততা বিশেষত ছিন্নমূল হয়ে যাওয়ার বার্তা নিয়ে আসবে, তা তাঁরা বুঝতে পারেন নি। একে তাঁরা এতটা গুরুত্ব দেননি—ইতিহাস অন্ততঃ তাই বলে। ১৯৪৬ সালের ৫ নভেম্বর *"Hindusthan Standard"* নামক পত্রিকায় কুমিল্লার প্রতিনিধি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে—শুধু নোয়াখালিতে ৩০০ ও কাছাকাছি জায়গাগুলিতে প্রায় ৪০০ জন মহিলা এই সময় ধর্ষিত হয়েছিলেন। দৈনিক আজাদ, ডন, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বসুমতী, *Morning News* ও *Observer* পত্রিকা থেকে জানা যায় খুলনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ময়মনসিং, বরিশাল, সিলেট ইত্যাদি স্থানে যে হিন্দু পরিবারগুলি নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে জীবন কাটাতো, তারা হঠাৎ করে এক অদ্ভুত সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। কারণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি তো বটেই, বরং বলা যায়, এক ভিন্ন বিপরীতমুখী অবস্থার সম্মুখীন হয় তারা। শৈবাল কুমার গুপ্ত উল্লেখ করেছেন যে, এই সময় যারা অপেক্ষাকৃত অর্থবান ছিল, তারা বাড়ির মহিলা ও শিশুদের রক্ষা করার ও সুস্থভাবে স্থানত্যাগ (পূর্ব-পাকিস্তান) করার জন্য 'জিন্না ফান্ড' এ প্রচুর অর্থ দিতে শুরু করে। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়-এর স্মৃতি থেকে বিপরীত ছবির কথাও শোনা যায়, এই সময় বহু মুসলমান ব্যক্তি হিন্দুদের রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল।

সমসাময়িক গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্র ঘাঁটলেও বোঝা যায়—এই সময়ে লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার ও মহিলাদের অপহরণ এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে

উঠেছিল। স্থানবদলের সময়েও মহিলারা সুরক্ষিত ছিলেন না। মাতৃভূমি হারানোর বেদনার সঙ্গে সঙ্গে তাই এক আতঙ্ক তাদের জীবনের অন্যতম সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। ১৯৫০ সালের ১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম মেল ও সূর্মা মেল—এই দুটি ট্রেনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোককে হত্যা করা হয়। এই সময় সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তা ও সমস্যায় পড়েছিল মহিলা ও শিশুরা। সর্বার্থেই মহিলাদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে শঙ্কাজনক। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে রক্ষা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুরুষটি তো সঙ্গে ছিলই না, উপরন্তু তার উপর ছিল—এক বা একাধিক শিশুর দায়িত্ব। তাই তারা সামাজিক-অর্থনৈতিক লাঞ্ছনা, ভীতি ও অনিশ্চিত জীবন নিয়েই এগিয়ে চলেছিলেন। এই সব মহিলাদের আরেকটি সমস্যা ছিল—ঐতিহ্যগত কারণে প্রতিরোধমূলক আন্দোলন করার জন্য লড়াকু মনোভাবের অভাব। কারণ তাঁরা যে সুবর্ণময় অতিক্রম করে এসেছিলেন, তার সঙ্গে সমকালীন সময়ের বৈসাদৃশ্য তাদের ভাবাবেগকে এক চরম নেতিবাচক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইয়াসমিন খান, উর্বশী বুটালিয়া, ভাজিরা ফাজিলা ইয়াকুবালী জমিনদার, অনিতা ইন্দর সিং—এই চারজনের লেখনীতেও উঠে এসেছে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের মনস্তাত্বিক সংকটের কথা ও মহিলাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই এর মানসিকতার তথ্য।

দুই বাংলার প্রচুর উপন্যাস, গল্প, আত্মজীবনী ও প্রবন্ধে দেশভাগ মূল উপপাদ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রতিটি লেখাই মূলতঃ শিকড়ের সন্ধানকে তুলে ধরে। এর মধ্যে উল্লেখ্য হল—প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়াপাতার নৌকা', অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', সত্যপ্রিয় ঘোষ-এর 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা', নারায়ণ সান্যাল-এর 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প', শক্তিপদ রাজগুরু 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি, গৌরকিশোর ঘোষ 'প্রেম নেই', জ্যোতির্ময়ী দেবী 'এপারে গঙ্গা ওপার গঙ্গা', দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রাম', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'পূর্ব-পশ্চিম' প্রভৃতি উপন্যাসে উঠে এসেছে উদ্বাস্তু সমস্যার নানান টুকরো ছবি। ওপার বাংলার তাজউদ্দীন আহম্মদের ডায়েরী, বদরুদ্দীন উমর-এর স্মৃতিকথা, আনিসুজ্জমান-এর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'কাল নিরবধি', সেলিনা হোসেন-এর 'গায়ত্রী সন্ধ্যা', সৈয়দ ওয়ালীউন্নাহ্-র ছোটগল্প 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' ইত্যাদি লেখা এই একই দুঃসময়ের ছবি তুলে ধরে। প্রতিটি লেখনীতেই উঠে এসেছে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে, রাজনীতি কিভাবে একটি দেশের হৃদয়কে ভেঙে দিতে পারে—তার-ই আলেখ্য। জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও এই একই অনুভব পাওয়া যায়। সোমনাথ হোড়, জয়নুল আবেদিন, যোগেন চৌধুরী প্রমুখের ছবিতেও এই একই আবেগ ও যন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে।

বিজয় মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায় স্টেশন থেকে ক্যাম্প ও ক্যাম্প থেকে কলোনী—এই পথটি ছিল প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষ বিশেষতঃ মহিলাদের জন্য একই ধরণের ভীতিপ্রদ, সঙ্কটমূলক ও সমস্যায় পরিপূর্ণ। শিয়ালদহ স্টেশনে সেই সময়ে যে সমস্ত মহিলাদের দেখা যেত, তারা অধিকাংশই ছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের পুরুষ আত্মীয়দের দ্বারা প্রেরিত ও এই দেশে সুরক্ষার জন্য আগত। এরা প্রত্যেকেই তাই উপচে পড়া ট্রেনে সংগ্রাম করে, অভিবাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রক্রিয়ায় ক্লান্ত, প্রায় নরক যন্ত্রণা থেকে আগত শিশুসহ একদল মানুষ, যারা শিয়ালদহ স্টেশনে অপেক্ষা

করত এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এক টুকরো জমি পাওয়ার আশায়। স্বভাবতঃই বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। এই প্রতীক্ষারত মহিলারা যে খুব একটা সুরক্ষিত ছিলেন না—তা বলাই বাহুল্য। সরকারি দিক থেকে যদিও রিলিফ ক্যাম্পগুলিকে বাঙালি উদ্বাস্তু মহিলাদের 'আশ্রয়স্থল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু All India Women's Conference-র রিপোর্ট থেকে উঠে আসে উদ্বাস্তু মহিলাদের বাস্তবিক অবস্থা কেমন ছিল তার ছবি। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির হয়ে যে সব ডাক্তাররা কাজ করতেন—তাদের রিপোর্ট থেকে লাঞ্ছনার ছবি পাওয়া যায়। এছাড়া নারী সেবা সংঘ, উদয়ভিলা, আনন্দ আশ্রম, 'উইমেন্স কো-অপারেটিভ হোম', অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন ইত্যাদি সমকালীন সংগঠনগুলির রিপোর্ট থেকে জানা যায়—অপহৃত মহিলারা এই সময় সবচেয়ে বেশি জটিলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। গার্গী চক্রবর্তীর[৪২] বই থেকে রেণুকা সেনগুপ্ত নামে এক ডাক্তারের কথা জানা যায়। তাঁর মতে মূল সমস্যা ছিল অপহৃত ও ধর্ষিত মেয়েদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি। মহিলাদের নিয়ে সরকার ও United Central Refugee Council ক্রমশঃ চিন্তিত হয়ে পড়লে, তাদের জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা করে। U. C. R. C. আবার উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তথাগত রায়[৪৩]ও এই রক্তাক্ত ও হিংস্র 'জিহাদ'-এর কড়া সমালোচনা করছেন, যা মধ্যবিত্ত সামাজিক- মূল্যবোধের ভিতকেও নাড়িয়ে দিয়েছিল, কিছুটা হলেও।

যশোধরা বাগচী ও শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত *"The Trauma & the Triumph : Gender and Partition in Eastern India"* নামক বইতে উদ্বাস্তু মহিলাদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার কথা জানা যায়।[৪৪] তারা যে লাঞ্ছনা ও বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন তা তাদের মনস্তত্ত্বে চিরকালীন স্মৃতি হয়ে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী ইতিহাসে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে "মহিলাদের অস্তিত্ব খোঁজার লড়াই" বলেই উল্লেখ করা হয়। কারণ সুরক্ষিত, সহজ, সরল পারিবারিক অবস্থান থেকে অনেক মহিলা সংগ্রাম করে, এমনকি পরিবারের আর্থিক দায় নিতে বাধ্য হন। তৎকালীন বাংলার পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ধারায় এই সামাজিক পরিবর্তন ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারণা। Mahila Atma Raksha Samity-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়—এই পরিস্থিতিতেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মহিলারা প্রথম নিজেদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন। তাই এই সমস্ত ছিন্নমূল মহিলারা যে বাংলার সনাতন পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী সমাজেও বিশেষতঃ তার নিয়মনীতিতে আঘাত হানতে পেরেছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দেশভাগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন তাই বাঙালি মহিলাদের ভাবমূর্তি পরিবর্তিত করেছিল। এই বিবর্তন মেয়েদের অনেক স্বাধীন, আত্মনির্ভর এবং তথাকথিত সামাজিক বিধিনিষেধগুলিকে অতিক্রম করে। একটি নতুন অস্তিত্বের জন্ম দিতে সহায়তা করেছিল। যে কারণে এই সময়কালকে বলা হয়— 'The emergence of new women'। উদ্বাস্তু জীবন ওই সময়ে এতটাই পরিবর্তনের দিশারী হয়ে

উঠেছিল যে—এটি ক্রমশঃ নতুন লেখনী, থিয়েটার, যাত্রা, চলচ্চিত্র ও চিত্রকলার মূল ভাবনা হয়ে ওঠে। তাই বলা যায় যে—বাঙালি বা কোনো কোনো অর্থে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসেও দেশভাগের এই ঘটনা ছিল এক জোয়ারের মতো, যা বিভিন্ন সংস্কারকে উপেক্ষা করে কে নতুন জীবনদর্শন ও অস্তিত্বের ইতিকথার জন্ম দেয়। তাই সর্বার্থে 'দেশভাগ' কে শুধুমাত্র নেতিবাচক দিক থেকে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

তিন : উদ্বাস্তু আন্দোলন (১৯৪৮-৬৫)

প্রাচীন যুগ থেকে ভারতে আগত বিভিন্ন অভিপ্রয়াণকারীদের মতো পূর্ব বাংলার শরণার্থীরা ভারত-বিজয় করতে এদেশে আসেননি। এসেছিলেন রিক্ত, নিঃস্ব, উৎপীড়িত অবস্থায় আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে। চেয়েছিল একটু মাথা গোঁজার মতো ঠাঁই আর বেঁচে থাকার মতো রুজি-রোজগারের একটু সুযোগের ব্যবস্থাপনা। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিশু পশ্চিমবঙ্গ ১৯৪৭ সাল থেকেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দু শরণার্থী স্রোতকে প্রথমে সুরক্ষা প্রদান ও পরবর্তীতে পুনর্বাসন দেবার জন্য হাত বাড়ালেও উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ও সরকারের ক্ষমতার আনুপাতিক হারের মধ্যে যে পরিমাণ অসামঞ্জস্য ছিল, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের ভাগে জুটেছিল প্রত্যাখ্যান। তাই একাধারে পারিবারিক বাস্তু হারানো ও অন্যদিকে নিজস্ব অস্তিত্ব নির্মাণ বা আবার নিজের ঠিকানা তৈরিই মূলত শিকড় থেকে ছিন্নমূল এই মানুষগুলোকে, নিজেদের স্বার্থের দ্বারা তাড়িত হয়ে, পশ্চিমবঙ্গের সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে আন্দোলন গড়ে তোলা বা আন্দোলনে অংশগ্রহণে মরিয়া করে তুলেছিল। পূর্ববাংলার শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের যে সত্যিকারের সে রকম কোনো পরিকল্পনাই ছিল না প্রথমদিকে, তা সমস্ত পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলিকে দেখলেই বোঝা যায়। অনিচ্ছায় নেহাত বাধ্য হয়ে দায়সারা গোছের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল অবাস্তব ও উদ্ভট।[৪৫] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগের সহযোগিতা ও নীতিনির্ধারণও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রদানের মতো আন্তরিক ছিল না।[৪৬] তাই পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। উদ্বাস্তু প্রশ্নে প্রথম সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য যে রাজনৈতিক সংগঠনের কথা উল্লেখ্য তা হল ১৯৪৮ সালে সংগঠিত নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্ম পরিষদ।[৪৮] ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নৈহাটিতে প্রথম যে অল বেঙ্গল রিফিউজি কনফারেন্স আহুত হয় কংগ্রেস নেতা অমৃতলাল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে। আর এই কর্মপরিষদের উত্থানের সহায়তা করেছিলেন যে সমস্ত নেতারা, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গণেশ দাস, মহাদেব ভট্টাচার্য, বিজয় মজুমদার, বিনয় রায়, চিত্ত বসু, গোপাল ব্যানার্জী প্রমুখরা। প্রথমে কংগ্রেস নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও ক্রমশঃ বামপন্থীরা এই প্রতিষ্ঠানে আগ্রহী হন। যাইহোক, এই সম্মেলনের মূল প্রস্তাবে প্রথম পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের স্থায়ী পুনর্বাসনের দাবী জানানো হয়। কর্মপরিষদের অন্যতম সদস্য মহাদেব ভট্টাচার্য (হিন্দু মহাসভাপন্থী) দৃঢ়ভাবে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রশ্নে উদ্বাস্তুদের সমঅধিকার দিতে

চেয়েছিলেন। তাই দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে তিনিই কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য যে কোনো দলের সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে রাজি ছিলেন। বিজয় মজুমদার প্রথম উদ্বাস্তুদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলমত নির্বিশেষে যে একটি বৃহৎ ফ্রন্ট গড়ে তোলা প্রয়োজন তা অনুভব করেন। উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসনের দাবি হবে এই ফ্রন্টের মূল কাজ।[৪৮] এই সময় দক্ষিণ কলকাতায় আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন গড়ে ওঠে যা ছিল দক্ষিণ কলকাতার শহরতলি বাস্তুহারা সংহতি। এই সময় উদ্বাস্তু প্রশ্নে সব কয়টি সংগঠনের একযোগে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এইভাবে ১৯৫০ সালে সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিস্ট রিপাবিকান পার্টি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা ১৩ই আগস্ট সংযুক্ত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদ বা ইউ সি আর সি নামক এক কেন্দ্রীয় পরিষদের জন্ম দেন। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল উদ্বাস্তুদের জন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণ এবং পশ্চিমবঙ্গে তাদের ভবিষ্যত সুনির্দিষ্ট করা। এই সংগঠনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল—এরা সরকারের পুনর্বাসন বিভাগের সঙ্গে দর-কষাকষিতে অবতীর্ণ হয়েছিল। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়[৪৯] এবং অশোক মিত্র[৫০]-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, ১৯৫০ সালের পূর্ববঙ্গে সংগঠিত দাঙ্গাগুলির ফলে হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের অভিমুখে উদ্বাস্তুদের যে অভিবাসন শুরু হয়, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হন, যে এত লোককে কিভাবে আশ্রয় দেওয়া যাবে। এই সময় প্রথম দিকে ইউ সি আর সি-র নেতারা যেমন অনিল সিনহা, ইন্দুবরণ গাঙ্গুলি, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখরা উদ্বাস্তুদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তু আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৫১ সালের উচ্ছেদ আইনকে কেন্দ্র করে। সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, জ্যোতিষ জোয়ারদার, জীবন লাল চ্যাটার্জী, ডঃ সুশীল জানা প্রমুখরা মিটিং-মিছিল-জনসভা প্রভৃতির মাধ্যমে এক নতুন ধরনের বিক্ষোভ জানানো বা আন্দোলনের ঐতিহ্যের জন্ম দেন। এই সময় তাঁরা সরকারকে সরাসরি আক্রমণ করে এই মত তুলে ধরেন যে কংগ্রেস নেতা ও সরকারের একাংশ মূলতঃ এই নিরীহ উদ্বাস্তুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন।[৫১] শুধু তাই নয় ১৯৫১ সাল থেকেই প্রথম শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক না থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলন মফস্বলে (মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, কুচবিহার) ছড়িয়ে পড়ে ও জনপ্রিয় হতে থাকে। তাদের প্রাথমিক দাবিগুলি ছিল উদ্বাস্তুদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসন, জমি প্রদান, শিক্ষা-স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ, কলোনীগুলির বৈধিকরণ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীও পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিগুলি আক্রমণ করে উদ্বাস্তু আন্দোলনে পরোক্ষভাবে হলেও অনেকটা গতি এনেছিলেন।[৫২] মূলতঃ ভাষা ও সংস্কৃতিগত কারণে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে স্থায়ী পুনর্বাসনে আগ্রহী ছিল না বলে এই দাবীটিও আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি এই সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুলেছিল। মধু ব্যানার্জী মন্তব্য করেছিলেন যে, "The present Government which was friendly with the Capitalists & Zamindars, resorted to violence in expelling refugees from the colonies."[৫৩] এই মতামতের বিরোধিতা করে কংগ্রেস নেত্রীবৃন্দ আবার বলেছিলেন যে তখনও অবধি

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পূর্ববাংলা থেকে আগত ছিন্নমূল এই উদ্বাস্তুদের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল, কিন্তু তারা যেভাবে বামপন্থী নেতাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তাতে কিছুদিনের মধ্যে তারা এই সহানুভূতি হারাবে।

১৯৫৩ সাল থেকে সরাসরি ইউ সি আর সি-র নেতার উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্য জনসভায় তুলে ধরতে শুরু করেন। বিশেষতঃ তাঁদের বক্তৃতায় প্রাধন্য পেতে শুরু করে উচ্ছেদ আইনের বিরোধিতা ও উদ্বাস্তুদের চাকরি প্রদানের বিষয়টি। অম্বিকা চক্রবর্তী এই সময় উদ্বাস্তুদের এই সমস্যাকে 'জাতীয় সমস্যা' বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর মতে শাসকদল উদ্বাস্তুদের 'মানুষ' বলেই মনে করে না। তাই তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন পুনর্বাসন পরিকল্পনাও তারা তৈরি করছে না। এই উদ্বাস্তুদের যদি পূর্বতন পেশা অনুসারে চাকরি প্রদান করা যায় তাহলে এই বিশাল জনসম্পদকে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৯৫৪ সাল থেকে সরকার উদ্বাস্তুদের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য ঋণ প্রদান করতে শুরু করেন বিভিন্ন খাতে। কিন্তু যদি কোন উদ্বাস্তুকে ৯০০ টাকা ঋণ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হতো তাহলে প্রথম কিস্তি ঋণ প্রদানের পরই তাকে অনুরোধ করা হতো যে দ্বিতীয় কিস্তির ঋণ প্রদানের আগে সম্ভব হলে ঋণ পরিশোধ করা শুরু করতে তাই একই সঙ্গে সমস্ত অর্থ না পাওয়ার ফলে সে উদ্বাস্তু পরিবারটির পক্ষে কোনো কাজ শুরু করা সম্ভব হত না এবং এই ঋণ প্রদানের পদ্ধতি ছিল ভিক্ষার সামিল।[৫৪] মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন এই পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের দ্বারা প্রদেয় টাকার পরিমাণ বা তাদের কার্য পদ্ধতি এমনই ছিল যে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত করা সহজ হয়নি। ১৯৫৩ সালের ১০ই মার্চ আইন সভার একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সুহৃদ কুমার মল্লিক চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, দেশভাগের পর থেকে মোট ৪৬ লাখ উদ্বাস্তু শুধু পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত সুযোগ সুবিধে দেবার বদলে আস্তে আস্তে মৃত্যুর গহ্বরের দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছে। উদ্বাস্তু ছাত্রদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হচ্ছে না, একবছরের থেকেও বেশি সময় ধরে, যেখানে তাদের বই কেনারই টাকা নেই সেখানে শর্ত করা হচ্ছে প্রথম বিভাগে পাশ না করলে স্টাইপেন্ড বন্ধ করে দেওয়া হবে। অনেক নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচারের কথাও বর্ণনা করেন (শ্রীমতি রেণুবালা সরকার ও অনিমা দত্তের বিবৃতি ঃ হালিশহর মল্লিকবাগ কলোনী)। বীরেন ব্যানার্জী এইক্ষেত্রে আরেকটা ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সরকারের বিরোধিতা করে কেন উদ্বাস্তুরা আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছে, তা বোঝাতে। ঘটনাটি এইরকম—দশারী বাগান ক্যাম্প-এ একটি মেয়ে ২-৩ বছর আগে ম্যারেজ লোনের জন্য দরখাস্ত করে লোন পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। এখন তার পুত্র সন্তান হয়েছে কিন্তু এখনও সে লোন পায়নি।[৫৫] উদ্বাস্তু নেতারা অভিমত দিতে থাকেন যে সরকারের উচিত একটি 'অ্যাডভাইসারি বোর্ড' তৈরি করা যেখানে এই সমস্যা সমাধানে সরকারকে সহায়তা প্রদান করার জন্য রিফিউজি কলোনী কমিটির থেকে কিছু প্রতিনিধি ও বামপন্থী সংগঠনগুলির থেকে কিছু সংখ্যক নেতাকে আহ্বান জানানো উচিত। এছাড়া উদ্বাস্তুরা যেসব জমিগুলি জবরদখল করে রেখেছে সেগুলির দাম যদি

সরকার সুনির্দিষ্ট করে তাহলে এই হতদরিদ্র পরিবারগুলি এগুলিকে ক্রয়ের মাধ্যমে জমির ওপর বৈধ অধিকার স্থাপন করতে পারে।

'স্বাধীনতা' পত্রিকা থেকে জানা যায় যে— ১৯৫৫-৬০ সাল পর্যন্ত সময়ে উদ্বাস্তু আন্দোলনের ধারা ক্রমশঃ বদলাতে শুরু করে। আন্দোলনের ভরকেন্দ্র ক্রমশঃ জেলানির্ভর হয়ে ওঠে। গোয়েন্দা দপ্তরের নথিপত্রও এই বক্তব্যের সভ্যতার প্রমাণ দেয়। আন্দোলনের কর্মসূচিও বদল হয়। যেমন উদ্বাস্তুদের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর একটি তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে ১৯৫৬ সালের ১৮ই মার্চ 'অল বেঙ্গল রিফিউজি ডিমান্ড ডে' হিসাবে পালিত হয়েছিল।[৫৬]

আরেকটি নতুন পরিবর্তন ছিল ১৯৫৮ সাল থেকে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মহিলাদের পৃথকভাবে অথচ সরাসরি অংশগ্রহণ। জনৈক অফিসারের লেখনী থেকে দেখা যায় যে, মহিলারা আলাদা করে সত্যাগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, মিটিং মিছিল প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের দাবি জানাচ্ছেন। এমনকি বর্ধমানে একটি ক্যাম্পে ৩রা এপ্রিল ১৯৫৮ তারিখে "Women Refugees Day" পালিত হয়।[৫৭] এছাড়া ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ সালের কাঁচড়াপাড়া পলাশি উইমেন ক্যাম্পে শ্রীমতি প্রভাবতী দে নস্কর, সরকারের সুরক্ষা ও পুনর্বাসন নীতির সামগ্রিক সমালোচনা করে বলেন যে—উদ্বাস্তুদের যেভাবে সরকার জোর করে দণ্ডকারণ্যে পাঠানোর চেষ্টা করছে, তা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।[৫৮] এছাড়া বাঁকুড়ায় শ্রীমতি ঊষারাণী ভট্টাচার্য, জানকী বিশ্বাস ও কনক মণ্ডল তাদের দাবিদাওয়া পূরণের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই একই সময়ে টিটাগড় উদ্বাস্তু মহিলা সমিতি দণ্ডকারণ্যে না গেলে সরকার ক্যাশ ডোল বন্ধ করে দেবে-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।

ক্রমশঃ মফস্বলে যে আন্দোলনগুলি জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল তার কারণ ছিল কলকাতায় প্রথম দিকে তৈরি কলোনীগুলি ছাড়া, পরবর্তী অধিকাংশ কলোনী তৈরি হয়েছিল জেলা শহরগুলিতে।

১৯৬০-এর দশকে উদ্বাস্তুরা আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকটি প্রতিবাদের কৌশল খুঁজে নেয়। ২৮শে নভেম্বর ১৯৬০ তে ইউ সি আর সি-র নেতৃত্বে কুপার্স ক্যাম্প ও রূপশ্রী পল্লীতে উদ্বাস্তুরা 'হাঙ্গার স্ট্রাইক'-এর সূচনা করে, সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার জন্য।[৫৯] ১৯৬১-৬২ সালেও শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ও ফুটপাতে উদ্বাস্তুরা জন্তুর মতো পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও এদের প্রতি ক্রমশ সহানুভূতি হারাচ্ছিল। সরকারের এই দীর্ঘসূত্রিতার মূল কারণ ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনে রাজন্য সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের বোঝাপড়ার অভাব। শ্রী হেমন্ত কুমার বসু বলেছিলেন উদ্বাস্তুরা হচ্ছে দেশভাগের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত একজন সম্প্রদায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত অন্য প্রদেশে না পাঠিয়ে পশ্চিমবঙ্গেই তাদের পুনর্বাসন প্রদান করা।[৬০] আর সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের আর অবশিষ্ট জমি নেই, তাই তাদের রাজস্থান, উড়িষ্যা, বিহার ও মধ্যপ্রদেশে পাঠানো হচ্ছে। তখনকার অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকেও এর সত্যতা কিছুটা প্রমাণিত হয়। ১৯৭১ সালে একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, যে ক্ষেত্রে পূর্বতন সময়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে জনবসতির ঘনত্ব ছিল প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৫০৪

জন, সেক্ষেত্রে ২৪ পরগণা জেলায় তা হয়ে দাঁড়ায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬১২ জন (১৯৬২-৬৩)।[৬১]

এই সময় থেকে সরকারি নীতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছিল। সরকার আস্তে আস্তে উদ্বাস্তুদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার দিতে শুরু করে এবং পুনর্বাসন পদ্ধতিও ক্রমশঃ বদল করে, যা ছিল আন্দোলনের বিজয়ের একটি অন্যতম ইতিবাচক দিক।[৬২] ১৯৬৪ সালে "Save Pakistan Minorities Committee" গঠিত হয় যার মূল দাবীদাওয়াগুলি ছিল—নতুন উদ্বাস্তুদের যথার্থ অভিবাসনের বন্দোবস্ত করা, অভিবাসন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ, সবার জন্য মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট-এর বন্দোবস্ত করা, অভিবাসনের সময় যথার্থ সুরক্ষা প্রদান, এই প্রক্রিয়ায় যে সব মেয়েদের অপহরণ ও ধর্ষণ করা হয়েছে তাদের উদ্ধার করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুরা যেসব সম্পত্তি ফেলে এসেছে তার জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। জীবনলাল চ্যাটার্জী, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুশীল কুমার চ্যাটার্জী, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী প্রমুখরা এই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তোষণ নীতিরও বিরোধিতা করতে শুরু করেন তাঁরা এবং পাকিস্তানের তৈরি বা ব্যবহৃত জিনিস না কেনার ডাক দেন।[৬৩] এই সময় উদ্বাস্তুরা সরকারের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার জন্য চাকরির আবেদন করতে শুরু করে। চাকরি না পাওয়া বা স্থায়ী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ৬০ নয়া পয়সা ক্যাশ ডোল-এর দাবী জানানো হয়, তাদের সুস্থভাবে জীবন ধারণের জন্য।

দেশভাগ পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে এই উদ্বাস্তু আন্দোলন ছিল এক জলবিভাজিক স্বরূপ। পশ্চিমবঙ্গে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে এই সময়ে যে বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল, উদ্বাস্তু আন্দোলনের ভূমিকা তাতে ছিল অনস্বীকার্য। তাই উদ্বাস্তু আন্দোলনকেও ইতিবাচক দিক থেকেই দেখা উচিত।

তথ্যসূত্র

১। Suranjan Das—*Communal Riots in Bengal,* 1905-1947, Oxford University Press, 1991, Delhi, pp. 208.

২। সুনন্দা সিকদার—*দয়াময়ীর কথা,* গাঙচিল, ২০০৮, কলকাতা, পৃ. ১৩-২৭।

৩। Dominique Lapierre and Larry Callins-*Freedom at Midnight,* Vikas Publishing House Pvt. Ltd., Fifth Reprint 2004, New Delhi, pp. xvi-xvii (preface).

৪। Suranjan Das—*ibid,* pp. 9-12.

৫। Annual Report on Emigration to the Labour Districts of Assam, cachar and Sylhet for the year ending 30th June, 1930 (File No. 5-7 (i) of 1930).

৬। *The Dawn,* 30 August, 1946.

৭। অমলেন্দু সেনগুপ্ত—*উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব,* পাল পাবলিশার্স, ১৯৯১, কলকাতা, পৃ. ১৪৭।

৮। Letter of Sir F. Burrows (Bengal) to Field Marshal Viscount wavell, Calcutta, 22 August, 1946, Letter No. 197 T. P. VOl-VIII.

৯। *ibid,* Para-7

১০। অমলেন্দু সেনগুপ্ত—প্রাগোক্ত, পৃ. ১৮৯।
১১। Tathagata Roy-*My people, uprooted-A saga of the Hindus of Eastern Bengal,* Ratna Prakashan, 2001, Kolkata, P. 89.
১২। *স্বাধীনতা,* ১৮ আগস্ট, ১৯৪৬।
১৩। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-*দাঙ্গার ইতিহাস,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ৫৯
১৪। আবুল হাশিম—*আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি,* চিরায়ত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ১০৬।
১৫। *প্রাগোক্ত,* পৃ. ১০৮।
১৬। কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—*দেশ বিভাগের অন্তরালে,* ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩৯।
১৭। Rakesh Batabyal-*Communalism in Bengal-From Famine to Noakhali, 1943-47,* Sage Publications, New Delhi, 2005, p. 294.
১৮। আবুল মানসুর আহমেদ—*আমার লেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* খোশরাজ কিতাব মাহল, ঢাকা, ২০০৬ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৯৯।
১৯। *Ashoka Guptap Papers,* Refugee Rehabilitation work in Noakhali, Tin Murti Bhavan, Sl. No. 1, 1946-47, pp. 194-196.
২০। বদরুদ্দীন উমর—*ধর্ম রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৩১।
২১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত—*প্রাগোক্ত,* পৃ. ২২২।
২২। *দৈনিক বসুমতী,* ২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৭।
২৩। *Morning News,* May 31, 1948.
২৪। Letter from Briesh Chandra Dutta, Assistant Secretary to the Govt. of West Bengal to the Chief Secretary to the Govt. of East Pakistan, Dated 30th April, 1948, Home Political, B. Proc., List-216, Bangladesh Archives.
২৫। *তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়েরী, ১৯৪৭-১৯৪৮,* প্রথম খণ্ড, প্রতিভাস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১০৮।
২৬। সেমন্তী ঘোষ (সম্পা)—*দেশভাগ : স্মৃতি ও স্তব্ধতা,* (প্রবন্ধ-বিপ্লব বালা—'যে গাছ রুয়েছি তার এই ফল হবে' : যারা থেকে গেলাম), গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ২২০।
২৭। হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়—উদ্বাস্তু। সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০। পৃ. ৯৩-১৩৭।
২৮। Pranati Chowdhury-*Refugees in West Bengal : A Study of the Growth and Distribution of Refugee Settlements within the CMD,* Occasional paper No. 55. CSSS. Calcutta, 1983.
২৯। Dr. B. C. Roy, 17th April, 1951, 3rd Session, Assembly Proceedings,

Vol. III, No. 3, p. 383.
৩০। Prafulla Kr. Chakrabarty-*The Marginal Men,* Lumiere Books, 1990, pp. 19-20.
৩১। Marcus Franda-*Radical Politics in West Bengal,* M.I.T. Press, USA, p. 38.
৩২। The Third year in West Bengal. (*A resume of the activities in the third year of Independence.*) August 15 : 1949-50, The director of publicity, West Bengal, p. 4
৩৩। Dr. B. C. Roy- Assembly Proceedings, Second Session (Sept.) Vol, 4, No. 4. page 79-80, 1950, 28th Feb.
৩৪। Hemanta Kr. Basu-2nd January, 1958, 20th Session Assembly Proceedings. Vol. XX No. 3 Page-601.
৩৫। Manidip Chatterjee-*A Board Outline of Action Programme for the Developmen of Refugee Colonies in C. M. D. A.* (C.M.D.A. August 1975, Page-4)
৩৬। Comments of the speaker, Assembly Proceedings (Budget), 3rd session, Vol. 3, No. 1, P. 2
৩৭। অমলেন্দু দে—"এবার নতুন পথে, নতুন লক্ষ্যের দিকে" (*সাত দশক, সমকাল ও আনন্দবাজার*), আনন্দ, সেপ্টেম্বর ২০০৫, পৃ. ৯২।
৩৮। শৈবাল কুমার গুপ্ত—*কিছু স্মৃতি কিছু কথা,* বিভাসা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫৭-১৫৮।
৩৯। অশোক মিত্র—*তিন কুড়ি দশ,* তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৬।
৪০। অশোক মিত্র—*আপিলা-চাপিলা,* আনন্দ, ২০০৩, পৃ. ৫৬।
৪১। Joya Chatterjee- "Right or Charity? The Debate over Relief and Rehabilitation in West Bengal, 1947-50" in Suvir Kaul (ed)-*The Partition of Memory : The afterlife of the division of India.* Delhi, Permanent, Black, 2001, p. 75.
৪২। Gargi Chakrabarty-*Coming out of partition-Refugee women of Bengal.* Bluejay Books. 2005. p. 43.
৪৩। Tathagata Roy-*ibid,* p. 348.
৪৪। Jashodhara Bagchi and Subhoranjan Dasgupta (ed)- *The Trauma and the Triumph : Gender and Partition in Eastern India,* Stree, 2003, P. 6.
৪৫। অনিল সিংহ—*পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু,* কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮।
৪৬। Ministry of Home Affairs, Home Dept. File No. 30\36/48 Apptts. (NAI).
৪৭। Arun Deb- "The UCRC : Its Role in Establishing the Rights of Refugee Squetters in Calcutta" in Pradip Kumar Bose (ed) *Refugees in West Bengal-Institutional Processes and Contested Indentities,* Calcutta Research Group, 2000, p. 65.
৪৮। প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী-*প্রান্তিক মানব, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা,* প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৫-৩৮।
৪৯। *প্রগোক্ত,* পৃ. ৯৩-১৩৭।
৫০। অশোক মিত্র—*প্রাগোক্ত,* পৃ.-৫৬।
৫১। Satya Priya Banerjee, I.B. File No. 321/22 (kw), Sl. No. 46/1922, Folder No.3, p. 97.

৫২। *Papers of* Dr. Shyama Prasad Mukherjee, Tin Murthi Bhaban, 1st Installment, Subject Files No. 164, pp. 101-102.
৫৩। Satya Priya Banerjee, ibid, p. 85.
৫৪। Ambika Chakraborty, I.B. File No. 165Z/2A (Part-V), Sl. No. 70/1924.
৫৫। Assembly proceedings, official Report, WBLA, Ninth Session (Budget), February-April, 1954, Vol.-IX, No. 2, pp. 1243-1254.
৫৬। Pran Krishna Chakraborty, I.B. File No. 1483/32, p. 32
৫৭। Hemanta Kumar Basu, I.B. File No. 329/27 (Part-VII), Sl. No. 130/1927, p. 82.
৫৮। Kunja Basu, I.B. File No. 335/29, Sl. No. 144/29, p. 108.
৫৯। History Sheet of Amritendu Mukherjee I.B. File No. 303/39.
৬০। Hemanta Kumar Basu, I.B. File No. 329/27, Sl. No. 131/1927, p. 392.
৬১। *Gazettee of India, West Bengal (24 Parganas),* Edited By- Barun De, March 1994, Chapter-III (People), p. 133.
৬২। *The West Bengal Weekly* (Journal), Vol-XIII, Saturday, April 15, 1967, No. 1 (Vol-13), p.3.
৬৩। Jiban Lal Chatterji, I.B. File No. 1041/16, Sl. No. 44/1916. p. 313.

Anindita Ghoshal, Department of History, Rishi Bankim Chandra College, Hugli, West Bengal
ghoshal.anindita@yahoo.com

পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি : সংকটের নবরূপ

আলাউদ্দিন মণ্ডল

বঙ্গভঙ্গের প্রবল সমর্থন[১] এবং তারপর দেশভাগের অব্যবহিত পূর্বের স্বাধীন সার্বভৌম বঙ্গদেশ গঠনের যাবতীয় প্রয়াসের যুগপৎ ব্যর্থতায় বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিরাট অংশের দেশত্যাগ যে আনুমানিক সামাজিক শূন্যতার জন্ম দিয়েছিল, তার বিষয়গত ভাবচ্ছাপ বৃহত্তর বাঙালি মুসলমান সমাজে স্পষ্ট, যদিও বোধ বীক্ষণের নির্ণায়ক জমাটভূমি আজও নির্মিতই হয়নি; রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৃতত্ত্বগত কারণ জায়মান থাকলেও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতাই মূলত তাকে অপরও একরৈখিক করেছে, 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' তাই বিলম্বে হয়েছে। বস্তুত বাংলার অধিবাসী মুসলমান জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিই একটি ধাঁধার মতন আমরা কি বাঙালি, নাকি মুসলমান ও পরে মুসলমান, কিংবা বাঙালি মুসলমান? এবং যদি আমরা বাঙালি মুসলমান হই, তবে কি আমরা আগে বাঙালি ও পরে মুসলমান, নাকি আগে মুসলমান ও পরে বাঙালি? এই ধাঁধাটি নানা রূপকে নানা ভাষাবন্ধে ভাবকল্পে আত্মপরিচয়ের সন্ধানকে আগেও ব্যাহত করেছে, আজও তা সমানভাবে ক্রিয়াশীল। আবার বাঙালিত্ব ও মুসলমানত্ব ধারণা দুটির মিশ্রণ (fusion) যত গাঢ় হয়েছে সম্মোহন ও প্যান ইসলামিক ভাবনার ভিত্তি। একদিকে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, পেশাগত পশ্চাৎপদতা ও অনিশ্চয়তা ভগ্নস্বাস্থ্য ও শিক্ষাহীনতা অপরিমেয় দারিদ্র ও বোবা চাহনি, বাপ-দাদার কাছ থেকে পাওয়া ধর্মবিশ্বাস মাদুলি ও কবজ; অন্যদিকে ঘটমান বাস্তবের রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাত, জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন, তার জাগরণস্পৃহা, বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়ে জনজীবনে তার দাবি উত্থাপন, আন্দোলনের মুখ প্রকাশ, অভিমুখ ও প্রতিপক্ষ নির্ধারণ, বিদ্বেষ ও বৈষ্যমের পরিমণ্ডল নির্মাণ, তার অন্তঃস্থ দ্বন্দ্ব, শ্রেণিচেতনা, স্ববিরোধিতা এবং আত্মঘাতী প্রবণতাসমূহের ক্ষীণ উচ্চারণের মধ্যেই খুঁজতে হবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি। সেক্ষেত্রে, মননের স্বরাজ যেমন জরুরি, তেমনি শ্রেণিক্রমে বিন্যস্ত আধিপত্যবাদী ও ধর্মবাদীদের ক্রমাগত কৃৎকৌশল চিহ্নায়নও অত্যন্ত জরুরি প্রসঙ্গ। সমাজের চিন্তন— অভিমুখ দ্বিবাচনিকতা, বহুস্বর, বিরুদ্ধ ভাবনা, সহৃদয়তা, স্বপ্নময়তা, সর্বোপরি লোকজবিশ্বাস ও লোকজসংস্কৃতিকে অনুসন্ধান করেই পুরাবৃত্তের কাছে শুনতে হবে অতীতের কথা।

কংগ্রেসের মতো মুসলিম লিগের নেতৃত্বও মুসলমান মধ্যবিত্তের দখলে থাকায় আন্দোলনে মধ্যবিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পায়;[৬] যদিও মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের প্রক্রিয়া অদ্যাবধি পূর্ণতা-ই পায়নি। বৃহত্তর মুসলিম সমাজ নিম্নবর্গীয়

মণ্ডল, আলাউদ্দিন : পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি : সংকটের নবরূপ
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 225-231